সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য যা করণীয়

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭)

আমাদের সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ ...।" আর নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ সেই ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করে। এছাড়াও নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব। তবে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ না হলে, জনগণের মালিকানা খর্ব হয়। একইসাথে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ রুদ্ধ এবং অশান্ত ও অস্থিতিশীল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তাই নির্বাচন সুষ্ঠু এবং অর্থবহ হতে হবে, তাহলেই তা হবে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য।

সুষ্ঠু নির্বাচন সকলেরই কাম্য। কিন্তু সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্তগুলো কী? অনেকেই একমত হবেন যে, আমাদের ১৯৯১ সালের নির্বাচন ছিল এযাবৎকালের সবচেয়ে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সাতটি উপাদান ওই নির্বাচনকে সফল করতে সহায়তা করেছিল। এগুলো হলো: (১) তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের প্রশ্নাতীত নিরপেক্ষতা ও নির্বাচনের জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টিতে তাদের দৃঢ় প্রত্যয়; (২) নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতহীনতা এবং এর প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের আস্থাশীলতা; (৩) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা; (৪) আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতিত্বহীনতা; (৫) স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণের একতা; (৬) কালো টাকার মালিক, পেশিশক্তির অধিকারী, দুর্নীতিবাজ তথা দুর্বৃত্তদের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রায় অনুপস্থিতি; এবং (৭) রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য সমসুযোগ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার।

আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন নিশ্চিত করতে হলে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এগুলো হলো: (ক) তত্ত্বাবধায়ক সরকার; (খ) নির্বাচন কমিশন; ও (গ) রাজনৈতিক দল। একইসাথে এলক্ষ্যে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা

সংবিধানের ৫৮ঘ(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সংসদ সদস্যগণের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যেরূপ সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ সকল সম্ভাব্য সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করিবেন।" নির্বাচনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিতান্ত সহায়কের হলেও, আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের নির্বাচন কমিশন একটি পক্ষপাতদুষ্ট অকার্যকর প্রতিষ্ঠানে এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলারাক্ষাকারী বাহিনী দলবাজির আখড়ায় পরিণত হয়েছিল। সর্বোপরি, আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গন পরিণত হয়েছিল দুর্বৃত্তদের অভয়ারণ্যে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মোটা দাগে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় রয়েছে। প্রথমটি হলো, নির্বাচন কমিশনকে পুণর্গঠনের মাধ্যমে এটিকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করা। দ্বিতীয়টি হলো, নির্বাচনের যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা।

নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন ও নিরপেক্ষ করার প্রাথমিক কাজটি সরকার এরই মধ্যে সম্পন্ন করেছে। কমিশনের পক্ষপাতদুষ্টু কমিশনারদেরকে বাদ দিয়ে তিনজন অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিকে কমিশনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন হবে কমিশনের দুর্নীতিপরায়ন ও পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকর্তাদের অপসারণ। আশা করি সরকার শীঘ্রই এ পদক্ষেপ নেবেন। এছাড়াও প্রয়োজন হবে কমিশনের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ এবং কমিশনারদের নিয়োগের পদ্ধতি ও কর্মের শর্তাবলী সুস্পষ্টকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সংবিধানের ১১৮(১)((৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আদেশ জারি।

নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর করতে হলে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। যদিও সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী, "নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন," বাস্তবতা বহুলাংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর অন্যতম কারণ হলো যে, বর্তমানে কমিশন ও এর সচিবালয়কে পৃথক করে দেখা হয় এবং সরকারের কার্যপ্রণালীর বিধি অনুযায়ী, কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা। *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* ১৯৭২-এ কমিশনের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেই তা করা সম্ভব। এছাড়াও প্রয়োজন হবে কমিশন সচিবালয়ের পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণের এবং এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ আইন এবং বিধি প্রণয়ন। সংবিধানের ৮৮(খ) ও (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক ব্যয় ও নির্বাচন কমিশনারগণের বেতন-ভাতা বর্তমানে সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়মুক্ত। অর্থাৎ কমিশনের এ সকল ব্যয়ের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে সংবিধানের ৮৮(চ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে* একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে কমিশনের সকল ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়মুক্ত করা যেতে পারে।

নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর করার জন্য কমিশনকে আরও কিছু ক্ষমতা প্রদান আবশ্যক। যদিও *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম* মামলার [৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)] রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অভিমত দেন যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে

সংবিধানের "তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ" ক্ষমতার অধীনে আইনের বিধানের সাথে সংযোজন (supplement) করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে, তবুও এ ক্ষমতাকে আইনের কাঠামোর মধ্যে আনা প্রয়োজন। গত সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে গুরুতর অসদাচারণের কারণে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচনের আগেই অধ্যাদেশের এই বিধান বাতিল করতে হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যাতে দাঁতহীন বাঘে পরিণত না হয়, তাই কমিশনকে প্রয়োজনীয় তদন্তের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রার্থীতা বাতিল, নির্বাচনী ফলাফল বাতিল ও নির্বাচন স্থগিত করার এবং নির্বাচনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসদাচারণের কারণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন। একইসাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বও কমিশনকে ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক।

নির্বাচনে যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করার কাজেও সরকার ইতোমধ্যে হাত দিয়েছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষ করার কাজটি অত্যন্ত দূরূহ। কারণ এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দলবাজি ও ফায়দাবাজি সংক্রামিত হয়ে পড়েছে। তবুও সরকার অনেকগুলো রদবদল এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে বেশ কিছু কর্মকর্তার নিয়োগ বাতিল করেছে। সর্বোপরি, এ ধারণা এখন সৃষ্টি হয়েছে যে, দল-মত নির্বিশেষে নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য সমসুযোগ তৈরির ব্যাপারে সরকার অনমনীয় এবং এক্ষেত্রে কারো পক্ষ থেকেই কোনরূপ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ বরদাশত করা হবে না।

আমাদের রাজনীতি আজ চরমভাবে কলুষিত। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিকরণ এর মূল কারণ। নির্বাচনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার করেছে এবং দুর্বৃত্তদের কাউকেই রেহাই দেবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। এছাড়াও সরকার দুর্নীতি দমন কমিশনের পুণর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছে এবং সম্ভাব্য অপরাধীদের সম্পর্কে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্নীতিবাজ, দখলদার, সরকারি সম্পদ লুণ্ঠনকারী, সন্ত্রাসের গডফাদার এবং গুরুতর অপরাধে অপরাধীদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার প্রক্রিয়াও সরকার শুরু করেছে। সরকারের এসকল সাহসী কাজ ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছে।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। আর কমিশনের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতার ওপরই নির্ভর করবে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা। তাই যথাসম্ভব দ্রুত ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনকে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অনতিবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ যার অন্যতম। এ দু'টি কাজ কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হলেই হবে না, এটি হতে হবে অর্থবহ। নির্বাচন অর্থবহ হবে যদি এর মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসে। এ ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক নয়। নব্বই-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় অনেকেরই ধারণা ছিল যে, দেশে পর পর কয়েকটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সাধারণ জনগণের কল্যান নিশ্চিত হবে। কিন্তু সকলের আশা আজ দুরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো যে, ভোটের অধিকার বা নির্বাচনই গণতন্ত্র নয় – নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র। এছাড়াও নির্বাচনসর্বস্ব "একদিনের গণতন্ত্র" অবশ্যম্ভাবীভাবেই ইজারাতন্ত্রে রুপান্তরিত হয়। আর এ লোভনীয় ইজারাকে বংশপরম্পরায় স্থায়ী করার জন্য সৃষ্টি হয় পরিবারতন্ত্র।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে* কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতার নতুন কিছু মাপকাঠি সংযোজন করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে যাতে সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারি, অর্থপাচারকারি, ঋণখেলাপি, বিল খেলাপি, নৈতিক স্খলনের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত দুর্বৃত্তরা ও সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদেরকে নির্বাচিত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য 'না ভোটে'র এবং সরকারি কর্মকর্তাদের অবসরগ্রহণের পর অন্তত তিন বছর নির্বাচন থেকে দূরে রাখার বিধানও আইনে সংযোজন করতে হবে।

এছাড়াও নির্বাচনকে অর্থবহ করার জন্য এতে অর্থ ও পেশীশক্তির প্রভাব দূর করতে হবে। এ লক্ষ্যে নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস ও নির্বাচনী বিরোধ দ্রুত মীমাংসের ওপর জোর দিতে হবে। আর এ জন্য প্রয়োজন হবে আইনি বিধানগুলোকে আরও জোরদার এবং আইন ভঙ্গকারীদের জন্য তড়িৎ ও কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা। নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে আইনি বিধান করে রিটার্নিং অফিসারদের মাধ্যমে প্রজেকশন মিটিং-এর আয়োজন করা যেতে পারে।

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি। গণতান্ত্রিক, আর্থিকভাবে স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও দুর্বৃত্তমুক্ত রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। কিন্তু রাজনৈতিক দলসমূহ নিজেদের সংস্কার করতে অনিচ্ছুক ও অপারগ, তাই এসকল প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কমিশনের অধীনে বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের বিধান করতে হবে। নিবন্ধনের শর্ত হবে: দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা, দলের অঙ্গ সংগঠনের বিলুপ্তি, মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে তিন বছরের সক্রিয় সদস্য হওয়ার বাধ্যবাধকতা ও দলের প্রাথমিক সদস্যদের পদ্ধতিগতভাবে মতামত গ্রহণের বিধান ইত্যাদি।

সৎ, যোগ্য ও জনকল্যানে নিবেদিত ব্যক্তিদের নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদেরকে তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনি বিধানকে আরও জোরদার করতে হবে। মে, ২০০৫ সালে বাংলাদেশ হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দেশিত তথ্যসমূহ প্রদানের বাধ্যবাধকতা *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে* অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একইসাথে তথ্যের সত্যতা এবং এর সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করার বিধান আইনে সংযুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* সংশোধনের লক্ষ্যে উপরিউক্ত প্রস্তাবগুলো 'সুজনে'র পক্ষ থেকে একটি অধ্যাদেশ আকারে ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

নির্বাচন প্রক্রিয়াকে রূপক অর্থে একটি খেলার সাথে তুলনা করা যায়। খেলার যেমন নিয়মকানুন থাকে, তেমনি নির্বাচনের জন্যও কতগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। আমাদের নির্বাচনী নিয়মকানুনগুলো অসম্পূর্ণ এবং অনেকক্ষেত্রে যথাযথ নয়। আর যে সকল নিয়মকানুন রয়েছে, সেগুলোও অনেকক্ষেত্রে কেউ মেনে চলে না। তাই আমাদের নির্বাচনী খেলার নিয়মকানুনগুলো প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে। প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের যথেচ্ছাচারই এর জন্য মূলত দায়ী। তাই রাজনৈতিক দলের ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের অসদাচারণই আজ সুষ্ঠু নির্বাচনের সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

আমাদের রাজনীতি আজ নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিবর্জিত এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠি স্বার্থে পরিচালিত একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। আর এ নষ্ট রাজনীতির দুষ্ট সংস্পর্শে এসে অনেক সৎ মানুষও পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছেন এবং দুর্বৃত্ততে পরিণত হয়েছেন। রাজনীতির সংস্পর্শে আসলেই যেন আজ আর সততা, ন্যায়নীতি ও নিষ্ঠা বজায় রাখা দুরূহ হয়ে পড়ে। আসেপাশে তাকালেই আমরা দেখতে পাই, রাজনীতিতে প্রবেশ করে আমাদের এক সময়ের অতি সৎ ও আদর্শবান ব্যক্তি নীতিহীন দস্যুতে পরিণত হয়েছেন। এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদেরকে আজ এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকেই নিজ নিজ দলে একটি আত্মশুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করতে হবে। অবাঞ্চিত ব্যক্তিদেরকে দল থেকে বহিস্কার করতে হবে। সত্যিকারের জনগণের স্বার্থে যদি তারা রাজনীতি করেন, তাহলে জনগণের কল্যান বিবেচনা করে তাদেরকে আজ এ দুরূহ কাজটি করতে হবে। দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বর্তমান অভিযান এ লক্ষ্যে একটি অপূর্ব সুযোগের সৃষ্টি করেছে।

উপসংহার

আমরা আশা করি যে, সকল রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে যথাসম্ভব দ্রুত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে এ নির্বাচন হতে হবে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ। সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্কার। আইনগুলোর কঠোর ও যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নির্বাচন কমিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ। একইসাথে প্রয়োজন প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণ। আমরা আনন্দিত যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ উদ্যোগ ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছে।

সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য – যে নির্বাচন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আনবে – আরও প্রয়োজন একটি অনুকূল পরিবেশ। এমন পরিবেশ যেখানে অর্থ ও পেশিশক্তির প্রভাব অনুপস্থিত। দুর্বৃত্তরা নির্বাচনে অংশগ্রহণে অযোগ্য। সর্বোপরি সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে উৎসাহিত। এমন পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা অপরিহার্য। তারা এগিয়ে আসলে এবং আত্মশুদ্ধি অভিযানে নামলেই একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েমের আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হবে।

এ কাজে নাগরিকদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে। তাদেরকে সক্রিয় ও সোচ্চার হতে হবে এবং পরিবর্তনের জন্য চাপ অব্যহত রাখতে হবে। কারণ কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের পথ অত্যন্ত বন্ধুর এবং সামনে পর্বতপ্রমাণ প্রতিবন্ধকতা। নাগরিকরা সক্রিয় হলেই স্বার্থান্বেষীরা বুঝবে যে, নির্বাচনী খেলার নিয়ম বদলে গেছে এবং তাদের প্রতারণা ও শঠতা আর কাজে আসবে না। তা না হলে অতীতের দুঃসহ পরিস্থিতি আবার ফিরে আসতে এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি রুশ কবিতার কথা মনে পড়ে, যার মূল কথা হলো: তোমার বন্ধুকে ভয় করার কারণ নেই, সে বড়জোর তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তোমার শত্রুকে ভয় করার কারণ নেই, সে হয়তো তোমাকে হত্যা করবে। কিন্তু সতর্ক থেকো সে সব ব্যক্তিদের থেকে, যারা হতাশ, নিরাশ, সন্দেহপ্রবণ ও সর্বোপরি নির্লিপ্ত। তারা তোমাকে হত্যাও করবে না, তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করবে না। কিন্তু তাদের কারণেই যুগে যুগে হত্যা ও বিশ্বাসঘাতকতা টিকে রয়েছে। এই দায় এড়ানো ও নির্লিপ্ত মানসিকতা পরিবর্তনের মাধ্যমেই নাগরিক সক্রিয়তা সৃষ্টি করাই আজ আমাদের সচেতন নাগরিকদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ করণীয় বলে আমরা মনে করি।

এটি আজ সুস্পষ্ট যে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে
(নির্বাচন কমিশনকে নিরপেক্ষ করার প্রাথমিক কাজটি সরকার এরই মধ্যে সম্পন্ন করেছে। কমিশনের পক্ষপাতদুষ্টু কমিশনারদেরকে বাদ দিয়ে তিনজন অত্যন্ত সন্মানিত ব্যক্তিদেরকে কমিশনে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন হবে কমিশনের দুর্নীতিপরায়ন ও পক্ষপাতদুষ্টু কর্মকর্তাদের অপসারণ। আশা করি সরকার শীঘ্রই এ পদক্ষেপ নেবেন। এছাড়াও প্রয়োজন হবে কমিশনের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ এবং কমিশনারদের নিয়োগের পদ্ধতি ও কর্মের শর্তাবলী সুস্পষ্টকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সংবিধানের ১১৮(১)((৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আদেশ জারি।

নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর করতে হলে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। যদিও সংবিধানের ১১৮(৪) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী, "নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন", বাস্তবতা বহুলাংশে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর অন্যতম কারণ হলো যে, বর্তমানে কমিশন ও এর সচিবালয়কে পৃথক করে দেখা হয় এবং সরকারের কার্যপ্রণালীর বিধি অনুযায়ী, কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অংশ হিসেবে দেখা হয়। তাই কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হবে কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এ কমিশনের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেই তা করা সম্ভব। এছাড়াও প্রয়োজন হবে কমিশন সচিবালয়ের পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণের এবং এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ আইন এবং বিধি প্রণয়ন।

সংবিধানের ৮৮(খ)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক ব্যয় ও নির্বাচন কমিশনারগণের বেতন-ভাতা সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়মুক্ত। অর্থাৎ কমিশনের এ সকল ব্যয়ের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে সংবিধানের ৮৮(চ)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে কমিশনের সকল ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের ওপর দায়মুক্ত করা যেতে পারে।

নির্বাচন কমিশনকে কার্যকর করার জন্য কমিশনকে আরও কিছু ক্ষমতা প্রদান আবশ্যক। যদিও *আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাশেম* মামলার [৪৫ডিএলআর(এডি)(১৯৯৩)] রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ অভিমত দেন যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করার স্বার্থে সংবিধানের "তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ" ক্ষমতার অধীনে আইনের বিধানের সাথে সংযোজন () করার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের রয়েছে, তবুও এ ক্ষমতাকে আইনের কাঠামোর মধ্যে আনা প্রয়োজন। গত সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে গুরুতর অসদাচারণের কারণে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাজনৈতিক দলগুলোর চাপে রাষ্ট্রপতিকে অধ্যাদেশের এই বিধান বাতিল করতে হয়েছে। নির্বাচন কমিশন যাতে দাঁতহীন বাঘে পরিণত না হয়, তাই কমিশনকে প্রয়োজনীয় তদন্তের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রার্থীতা বাতিল, নির্বাচনী ফলাফল বাতিল ও নির্বাচন স্থগিত করার এবং নির্বাচনের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অসদাচারণের কারণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন। একইসাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠনগুলোর নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বও কমিশনকে ফিরিয়ে দিতে হবে।)

নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার পদক্ষেপের পাশাপাশি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনকেও কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একটি নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ যার অন্যতম। এ দু'টি কাজ কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হলেই হবে না, এটি হতে হবে অর্থবহ। নির্বাচন অর্থবহ হবে যদি এর মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে পরিবর্তন আসে। এ ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা ইতিবাচক নয়। নব্বই-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের সময় অনেকেরই ধারণা ছিল যে, দেশে পর পর কয়েকটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। কিন্তু আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো যে, নির্বাচনই গণতন্ত্র নয় – । নির্বাচনসর্বস্ব "একদিনের গণতন্ত্র" ইজারাতন্ত্রে রুপান্তরিত হয়। আর এ ইজারাকে বংশপরম্পরায় স্থায়ী করার জন্য সৃষ্টি হয় পরিবারতন্ত্র।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুণগত মানে মৌলিক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ও সংযোজনের উদ্যোগ নিতে হবে। আইনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতার নতুন কিছু মাপকাঠি সংযোজন করা দরকার। এ সংযোজনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা দরকার যাতে সন্ত্রাসী, কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ, চোরাকারবারি, অর্থপাচারকারি, ঋণখেলাপি, বিল খেলাপি, নৈতিক স্খলনের অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত দুর্বৃত্তরা ও সরকারের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তিরা যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে।

ব্যয়হ্রাস, বিরোধ নিস্পত্তি
নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি